একক ৩১ ❐ শব্দার্থতত্ত্ব

গঠন

৩১.১ উদ্দেশ্য

৩১.২ প্রস্তাবনা

৩১.৩ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

৩১.৪ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-অর্থের নানারূপ

৩১.৫ ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্বের স্থান

৩১.৬ শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

৩১.৭ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

৩১.৮ সুভাষণরীতি

৩১.৯ শব্দার্থ ও ইতিহাস উপাদান

৩১.১০ সারাংশ

৩১.১১ অনুশীলনী

৩১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৩১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- শব্দ ও তার অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- শব্দের ব্যাবহারিক বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে কীভাবে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভাষাচর্চায় শব্দার্থতত্ত্বের গুরুত্ব কোথায় এবং কতটা তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- শব্দার্থ পরিবর্তনের সহায়ক কারণগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শব্দের অর্থান্তর ঘটবার নানা প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা বাগধারায় অর্থপরিবর্তনের বিচিত্র পদ্ধতি হিসাবে 'সুভাষণ' রীতিটিকে চিনে নিতে পারবেন।
- ভাষায় ঐতিহাসিক তথ্যসংরক্ষণে শব্দার্থের ভূমিকা কতখানি তা জানতে পারবেন।

৩১.২ প্রস্তাবনা

যে কোনো ভাষারই দুটি প্রধান দিক হল : তার বাইরের প্রকাশকূপ, যেটি প্রকৃতপক্ষে ভাষার গঠনগত দিক, আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে যেটি তার ধ্বনিনির্ভর দিক। আর ভাষার অন্য প্রধান দিকটি হল তার ভিতরের ভাব বা অর্থ, যেটি প্রকৃতপক্ষে ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের নানা মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বাইরের কাঠামোর যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি তার ভিতরের অর্থেরও নানা পরিবর্তন হয়। কোনো শব্দের সঙ্গে এই পরিবর্তনশীল অর্থের সম্পর্কে কতখানি নিকট সেই বিষয়টি এবার আমরা দেখব।

৩১.৩ শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক

শব্দ কোনো বস্তু বা ভাব সম্পর্কে আমাদের চেনাকে নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট করে। কোনা শব্দকে তার ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে, কোন্ অর্থ বোঝাবার জন্য তার উৎপত্তি তা বুঝতে পারা যায়। কখনও কখনও দেখা যায় একটি শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করকতে সক্ষম। যেমন—'রাগ' শব্দটি ক্রোধ অর্থে, প্রণয় অর্থে বা গানের নির্দিষ্ট স্বরসমন্বয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়াও লক্ষ্যণীয়। একটি বস্তু বা একটি ভাব একাধিক শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। যেমন নদী বোঝাতে তটিনী, স্রোতস্বিনী, গাঙ নানাধরেনর শব্দ প্রযুক্ত হয়। এর থেকে একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গী কোনো ব্যাপার নয়। শব্দ সময়ে সময় পোষাক বদলের মত অর্থানুষঙ্গ বদল করে। আসলে সভ্যতার বিবর্তনের অমোঘ নিয়মে ভাষার ধ্বনিগত গঠনের দিকটি যেমন প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে, সেই একই অনিবার্য কারণে অর্থের সঙ্গে শব্দের সম্পর্কসূত্রও শিথিল হয়ে উঠেছে। কালের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জ্ঞানের সীমান প্রসারিত হয়েছে, তার পরিচিত বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, যার ফলে অনেক সময়ই একটি শব্দ বা শব্দমূল একাধিক বস্তু বা ভাবের বোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে—যার প্রত্যক্ষ ফল—শব্দ ও তার অর্থের নির্দিষ্ট সম্পর্ক বন্ধন থেকে মুক্তি। শব্দের অর্থ পরিবর্তনও এরই ফলশ্রুতি। মোটের উপর আমরা বলতে পারি অর্থ শব্দের এমন এক শক্তি যা পরিবর্তনশীল। সময়ের গতির সাথে সাথে, সভ্যমানুষ মনের ভাব প্রকাশ করতে চেয়ে, শব্দের এই বিশেষ শক্তিকে নানাভাবে রূপান্তরিত করেছে।

৩১.৪ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-অর্থের নানারূপ

অর্থকে শব্দের একটি বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতা হিসাবে আমরা চিহ্নিত করলাম। সেইসঙ্গে এও দেখলাম যে এই শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে। শব্দের অর্থশক্তির নানারূপ বৈচিত্র্যকেই অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা—এই তিনটি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই তিনটি শক্তির মধ্যেই শব্দার্থের মূল রহস্য ধরা আছে। শব্দশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্রে এই তিনটি অর্থরূপ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এই সকল শাস্ত্রে যেভাবে এই তিনটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে এই প্রকার—অভিধা দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের এবং লক্ষণা দ্বারা গৌণার্থের বোধ জন্মায়। আর এই দুই শক্তি যে তাৎপর্যার্থ জ্ঞাপন করতে পারেন না, সেই ব্যঙ্গার্থের বোধ জন্মায় ব্যঞ্জনশক্তি।

উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক। ধরুন আমরা যখন বলি 'রিকসা' বা 'ট্যাকসি' তখন ওই বিশেষ যান দুটি সম্পর্কে আমাদের নির্দিষ্ট যে ধারণা তার দ্বারা অর্থবোধ ঘটে। এটি ওই শব্দদুটির অভিধা শক্তির দ্বারা ঘটেছে—আমরা এইভাবে বিষয়টি দেখতে পারি। আবার দেখুন ; পথচলতি অবস্থায় যখন এই যানগুলির প্রয়োজনে আমরা রিকসাচালক বা ট্যাকসিটালককে ডাকি, তখনও ডাক দিই শুধু মাত্র 'রকসা' বা ! এই রিকসা' কিংবা 'ট্যাকসি' বলে। বলাবাহুল্য নিষ্প্রাণ যানদুটি আমাদের লক্ষ্যবস্তু নয়, আমাদের লক্ষ্য তাদের চালক। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু 'ট্যাকসি' বা 'রিকসা' বলে ডাক দিলেও চালকরা বোঝেন যে তাঁদেরই ডাকা হচ্ছে। অর্থবোধের এই বিশিষ্টতা শব্দের লক্ষণাশক্তির প্রকাশ। প্রথম উদাহরণে অভিধা হিসাবে আমরা শব্দের মুখ্যার্থকে প্রধান হতে দেখছি। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে শব্দের গৌণার্থই লক্ষণা হিসাবে প্রধান হয়ে উঠেছে।

এইবার অর্থের তৃতীয় রূপভেদটিতে আসুন। বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী হিসাবে আমরা সবাই 'গাছ' এবং 'পাথর' শব্দদুটির অর্থ জানি। কিন্তু কথায় আমরা যখন 'গাছপাথর' শব্দটি প্রয়োগ করি (বয়সের গাছপাথর নেই) তখন উদ্ভিদ বা প্রস্তর—কোনোটিই অর্থে বজায় থাকে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অর্থ—অতিবৃদ্ধ, এমনই একটি অর্থবোধ ঘটে। তাৎপর্যগত অর্থ প্রকাশের এই বিশেষ ক্ষমতাকেই 'ব্যঞ্জনা' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এইভাবে ভাষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দের অর্থগত ত্রিশক্তি লক্ষ্য করা যায়। ভাষাব্যবহারকারী মানুষ শব্দের কোন্ শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে, কোন্ অর্থটিকে বজায় রাখবেন, তা নির্ভর করে দেশকালানুযায়ী ভাষার ঔচিত্যবোধের উপর এবং ওই ব্যক্তির প্রকাশ ক্ষমতার উপর। মাতৃভাষায় আমাদের যে সহজাত অধিকার, তার উৎস আমাদের প্রতি মুহূর্তের শ্রবণ জাত অভিজ্ঞতা। এর থেকেই শব্দ ও তার অর্থ সম্পর্কে বোধের জন্ম ও ব্যবহারিক সক্ষমতার জন্ম।

৩১.৫ ভাষা বিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্বের স্থান

শব্দার্থতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্পর্কবিচার, অর্থপরিবর্তনের কারণ ও পরিবর্তিত অর্থের নানা শ্রেণিভেদ সম্পর্কে ভাষাতত্ত্বের যে দিকটি গড়ে উঠেছে সেটিকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার আওতায় আনতে প্রথমদিকে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীই নারাজ ছিলেন। তাঁদের মতে—অর্থপরিবর্তন আসলে মানুষের মনের খেলর ফলশ্রুতি এবং যেহেতু এই মনকে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা যায় না, তাই শব্দ ও অর্থের বিষয়টি ভাষাবিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative) ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ যেহেতু অর্থ ভাষার শব্দাবলীর দ্বারা বাক্য গঠনের আভ্যন্তরীণ নির্মাণের প্রক্রিয়াটির (deep structure) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এর থেকে একটি জিনিস আমাদের কাছে স্পষ্ট—তা হ'ল শব্দার্থই যে কোনো ভাষার প্রাণ। এই ভাব বা অর্থ বাদে ভাষার কোনো উপযোগিতাই থাকে না। তাই শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

৩১.৬ শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ

আমরা আগেই দেখেছি যে কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার অনেকটাই ঐ ভাষা ব্যবহারকারীর ইচ্ছানুগ। সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার বিবর্তন অনুযায়ী মানুষের মনের গঠন ও অভিজ্ঞতার তারতম্য ঘটে। তারই ফলে মানুষ যখন ভাষা ব্যবহার করে, তার নিজের সেই আভ্যন্তরীণ বদল ভাষার বাইরের কাঠামোটিকে যেমন বদলে দেয়, তেমনি তার ভিতেরর অর্থটিকেও পরিবর্তিত হতে বাধ্য করে। ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনেরও নানা কারণ আছে

তেমনি অর্থ পরিবর্তনেরও নানা কারণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই কারণগুলির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বেশি যে তাদের সবগুলিকেই একটিমাত্র আলোচনায় সীমিত করা কষ্টাসাধ্য। তবে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর পর্যালোচনা অনুযায়ী এই কারণগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায় : (১) স্থূলকারণ এবং (২) সূক্ষ্ম কারণ। এই দুই ক্ষেত্রেই আবার নানা উপশ্রেণিতে বিভাজিত হবার মতো কারণসমূহও লক্ষ্য করা যায়।

অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণ ঃ

দেশ-কাল, অনুযায়ী, ভাষায় শব্দ ব্যবহারকারী মানুষের অভিজ্ঞতার তারতম্যে শব্দের যে অর্থান্তর ঘটে, সেগুলিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এবিষয়ে প্রভাবসৃষ্টিকারী কারণগুলিকে আমরা তিনটি সূত্রে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন—(১) ভৌগোলিক বা ভিন্ন পারিবেশিক কারণ, (২) ঐতিহাসিক কারণ এবং (৩) উপকরণগত কারণ। আসুন, প্রথমে এই তিনটি কারণে কিভাবে শব্দ তার অর্থ বদলে নেয়, বাংলা ভাষার শব্দ অনুযায়ী আমরা তা লক্ষ্য করি।

ভৌগোলিক বা ভিন্ন পারিবেশিক কারণ ঃ

একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরুন ফার্সিতে প্রচলিত 'মুর্গ', শব্দটির অর্থ যে কোনো পাখি। কিন্তু আগন্তুক শব্দ হিসাবে বাংলাভাষায় প্রবেশ করে এর প্রয়োগ বিশেষ একটিমাত্র পাখি—মোরগ বা মুরগি (এক কথায় তৎসম 'কুক্কুট' অর্থে) বোঝাতে সীমাবদ্ধ হয়েছে। একইরকমভাবে ফার্সী 'দরিয়া' শব্দটি মূলে 'নদী' বোঝালেও, বাংলায় এই শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'সমুদ্র'। অনুরূপ কারণেই লক্ষ্য করুন আরও কত শব্দে এজাতীয় অর্থান্তর লক্ষ্য করা যায়—বাংলায় 'শাক' বলতে ভোজ্য উদ্ভিদকে বোঝালেও, ভারতের হিন্দীভাষী অঞ্চলে 'শাক' নিরামিষ তরকারি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ঐতিহাসিক কারণ ঃ

জীবনযাত্রার পরিবর্তন অনেকসময়ই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে পিছনে সরিয়ে ভিন্নতর অর্থকে সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন ধরুন 'আর্য' শব্দটি। বুৎপত্তি (ঋ + ন্যৎ = আর্য) অনুযায়ী এই শব্দের অর্থ গমনধর্মী, বন থেকে বনান্তরে যাযাবরবৃত্তিধারী একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। পরে কৃষিনির্ভর, স্থিতিশীল জীবনযাত্রা গড়ে উঠলেও তাদের 'আর্য' নামটিই থেকে যায়, যার পরিবর্তিত অর্থ হয়ে ওঠে 'ইন্দো ইউরোপীয় বংশের নৃজাতি'। এরকম অর্থ পরিবর্তনের আরও একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখতে পারেন 'বিবাহ' 'পাণিগ্রহণ' ইত্যাদি শব্দগুলিকে। আদিমকালে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে বলপ্রয়োগে হরণ করা এবং বহন করে নিয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল বলে এই বিশেষরূপে বহন কার অর্থে 'বিবাহ' এবং বলপ্রয়োগে গ্রহণ করা অর্থে 'পানিগ্রহণ' শব্দগুলি ব্যবহৃত হোত। বর্তমানে সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে এই বর্বর প্রথার অবসান ঘটলেও শব্দগুলি পরিবর্তিত অর্থ গ্রহণ করে ভাষায় টিকে রয়েছে। উল্লিখিত দুটি শব্দই এখন 'পরিণয়সূত্র' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উপকরণগত কারণ ঃ

যে উপকরণে কোনো বস্তু তৈরি হয়, সেই উপকরণের নাম বা ধর্ম অনুযায়ী অনেকসময় ওই বস্তুটির নামকরণ হয়, কিন্তু পরে সেই উপকরণটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও পুরনো নামটিই বজায় থাকে। যেমন ধরুন 'কলম' শব্দটির মূল অর্থ 'শর' বা 'খাগ' যা একসময় লেখনী হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখন শরের ব্যবহার অবলুপ্ত তো বটেই, উপরন্তু লেখনী নির্মাণে হেন বস্তু নেই যা ব্যবহৃত হয় না। অথচ সবকটি ক্ষেত্রেই 'কলম' শব্দটি ব্যবহার করতেই আমরা অভ্যস্ত।

লক্ষ্য করুন, পুরনো নামটির যোগ উপকরণটির সাথে। আর এই পুরনো নাম দিয়েই যখন নতুন জিনিসটিকে বোঝাচ্ছি, তখন তার সম্পর্ক আর ওই জিনিসটি কিসে তৈরি হয়েছে সেই উপকরণের সঙ্গে নয়, শুধুমাত্র জিনিসটির সঙ্গেই। এরকম অর্থ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আপনি আরও অনেক খুঁজে পাবেন। একসময় জল বা বালিভর্তি ঘড়ার সাহায্যে সময় নিরূপণ করা হত, তাই তার নাম ছিল 'ঘড়ি'। আধুনিক যান্ত্রিক সময়নির্ধারক যন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা একটি ব্যাপার হলেও তার নাম রয়ে গেছে 'ঘড়ি'। তুলো দিয়ে তৈরি হ'ত বলেই 'তুলি' বর্তমানে যা নাইলন তন্তু বা পশুলোম তৈরি হয়, কিন্তু তার 'তুলি' নামটি অপরিবর্তিত।

অর্থ পরিবর্তনের সূক্ষ্ম কারণ ঃ

এই জাতীয় কারণটি মূলত ভাষা ব্যবহারকারীর প্রকাশসামর্থ্য ও ঔচিত্যবোধের উপর নির্ভর করে অর্থ পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রেও অর্থ পরিবর্তনের স্থূল কারণের মতই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করা যায়, যাদের আমরা শ্রেণিভুক্ত করতে পারে এইভাবে—(১) সাদৃশ্য, (২) বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার, (৩) শব্দ প্রয়োগে অসর্তকতা ও অজ্ঞতা, (৪) অল্পায়াস প্রবণতা এবং (৫) আলংকারিক প্রয়োগ।

(১) সাদৃশ্য ঃ

ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন সাদৃশ্যের ভূমিকা অনেকখানি, শব্দার্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাই। যেহেতু দেহের সমস্ত অঙ্গাপ্রত্যঙ্গের মধ্যে মাথাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ অবস্থিত, সেই কারণে এই অর্থসাজুয্যে শ্রেষ্ঠতা বা উচ্চতা বোঝাতে আমরা যথেচ্ছ 'মাথা' শব্দটিকে ব্যবহার করি। যেমন 'গাঁয়ের মাথা', 'গাছের মাথা', 'মাথায় রাখা', 'মোড়ের মাথা' ইত্যাদি। 'বড়' বা 'বৃহৎ' অর্থে 'রাম' শব্দটির ব্যবহার (রাম ছাগল, রামদা) বা অনুরূপভাবে 'রাজ' শব্দটির প্রয়োগও (রাজপথ, রাজহাঁস, রাজগাঁদা) এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। আকারের বিশালত্ব, রাজকীয়তা এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে সমীকৃত হয়েছে এই দুটি ক্ষেত্রেই।

(২) বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার ঃ

সাধারণ মানুষের ধারণা—অশুভ বিষয় বা বিপজ্জনক বস্তুর নাম উচ্চারণ করতে নেই। এই সংস্কারের বশেই কোনো বিপজ্জনক বস্তু বা অশুভ বিষয়কে কোনো একটি শুভ বা শোভন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একে আপনি সুভাষণ বলে অভিহিত করতে পারেন। এই প্রবণতায় অনেক সময়ই দেখা যায়—নতুন নামটির নতুন অর্থে প্রয়োগ হতে হতে তার অর্থগত পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন, 'মৃত্যু' অর্থে 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' বা 'সাপ' বোঝাতে 'লতা', বসন্ত রোগকে 'মায়ের দয়া' বা 'শীতলায় দয়া', কুসীদজীবি'কে 'মহাজন' বলা এই বিশ্বাস বা সংস্কারচ্ছন্ন অর্থবিবর্তনেরই ফলশ্রুতি।

(৩) শব্দ প্রয়োগে অসতর্কতা ও অজ্ঞতা ঃ

কোনো শব্দের মূল অর্থটি না জেনে, তাকে ভিন্ন, সম্পূর্ণ আলাদা কোনো অর্থে প্রয়োগ করলে, অনবধানজনিত অর্থান্তর ঘটার সম্ভাবনা সেখানে থাকে। যেমন ধরুন 'সোচ্চার' শব্দটি। আমরা আমাদের চারপাশে এই শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করি 'জোরে বলা' বা 'ঘোষণা করা' অর্থে। অথচ দেখুন শব্দটির মূল অর্থ আদৌ এর সঙ্গে জড়িত নয়। কারণ মূল অর্থটি হ'ল 'সশব্দ বমন'। ঠিক তেমনি 'পাষণ্ড' শব্দের মূল অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যসী না বুঝিয়ে 'নিষ্ঠুর' অর্থে প্রয়োগ করা কিংবা অল্প বা ছোট বোঝায় এমন 'স্তোক' শব্দটিকে অজ্ঞাতবশত 'স্তোকবাক্য' হিসাবে ব্যবহার করা—আমাদের এই জাতীয় প্রবণতা থেকেই ভাষায় স্থায়ী হয়ে দেখা দেয়।

(৪) অল্পায়াস প্রবণতা ঃ

ভাষা ব্যবহারে শৈথিল্যের বশে আমরা অনেকসময় কোনো একটি শব্দগুচ্ছের সবটুকু ব্যবহার না করে, তার অংশবিশেষ উচ্চারণ করেই কাজ চালিয়ে নিতে চেষ্টা করি। একে শব্দ-সংক্ষেপ বা শব্দের অঙ্গচ্ছেদ বলতে পারেন। যেমন—'দণ্ডবৎ প্রণাম' কালক্রমে 'দণ্ডবৎ'-মাত্র হয়েই প্রণামের প্রক্রিয়াটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। 'খবরের কাগজ' না বলে আমরা প্রায়শই শুধু 'কাগজ' বলে সংবাদপত্রের অর্থটিকে পরিস্ফুট করে তুলি। কিংবা 'সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া' আমাদের কাচে হয়ে ওঠে 'সন্ধ্যা দেওয়া'।

(৫) আলংকারিক প্রয়োগ ঃ

বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে, আলংকারিক বাচনভঙ্গি ব্যবহারের ফলে বহু শব্দেরই মূল অর্থ পিছনে সরে গিয়ে, বিচিত্র অর্থ প্রকাশ করতে দেখা যায়। যেমন—বাড়ি মাথায় করা, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, মামার বাড়ি (জেলখানা অর্থে), শ্রীঘর (ঐ একই অর্থে) বললে, আমরা ভুলেও মূল অর্থ খোঁজার চেষ্টা করি না। কারণ এই দৃষ্টান্তগুলির আলংকারিক অর্থই আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল। লক্ষ্য করুন, বিনয় বা নম্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাতেও আমরা প্রায়ই শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ করি। নিমন্ত্রিতকে "দুটি ডালভাত" খাবার জন্য অনুরোধ করি, নিজের বাড়িকে বলি 'গরীবের বাড়ি'।

এইভাবে লক্ষ্য করুন বক্তা বা ভাষাব্যবহারকারী ব্যক্তি কীভাবে তাঁর বিবক্ষা অনুযায়ী শব্দ ও অর্থের সম্পর্কটিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যে দৃষ্টান্তগুলি আমরা ইতপূর্বে দেখলাম, নজর করুন তাতে দুটি ধরনের পরিবর্তনসূত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রতমত শব্দ যেখানে নিজেদকে অপরিবর্তিত রেখে অর্থকে বদলে নিচ্ছে সময়ের সাথে সাথে ('কলম', 'আর্য বা 'দরিযা' জাতীয় শব্দ) দ্বিতীয়ত অর্থ তার প্রাধান্য বিস্তার করে, তার পরিচ্ছদস্বরূপ শব্দটিকে বদলে নিচ্ছে (মাথা, গঙ্গাপ্রাপ্তি, পাষণ্ড, কাগজ, শ্রীঘর ইত্যাদি শব্দের মতো দৃষ্টান্তে)। আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে অর্থপরিবর্তনের স্থূল কারণগুলি প্রথম ক্ষেত্রে সক্রিয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে প্রধানত সক্রিয় হয়ে উঠেছে অর্থপরিবর্তনের মনস্তত্ত্ব নির্ভর সূক্ষ্ম কারণগুলি।

৩১.৭ শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

আমরা পূর্বে দেখেছি শব্দের প্রাথমিক বাচ্যার্থ অভিধারূপে, লক্ষ্যার্থ লক্ষণরূপে এবং ব্যঙ্গার্থ ব্যঞ্জনারূপে পরিস্ফুট হয়। ই সবকটি ক্ষেত্রেই শব্দের অর্থান্তর ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কোনো শব্দ ভাষায় দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হতে হতে, কখনও তার অর্থের ব্যাবহারিক পরিসীমা সংকুচিত হয়,. কখনও আবার এই পরিসীমা প্রসারিত হয়। এরই ফলকথা শব্দার্থ পরিবর্তনের নানা ধারা। এই ধারাগুলিকে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে পঞ্চমুখীরূপে দেখা যায়—

(১) অর্থের উন্নতি (Elevation of meaning)

(২) অর্থের অবনতি (Deterioration of meaning)

(৩) অর্থের সংকোচন (Reductiion of meaning)

(৪) অর্থের প্রসার (Expansion of meaning)

(৫) অর্থসংক্রম / অর্থসংশ্লেষ (Transfer of meaning)

আসুন, এইবার আমরা দেখি এই পঞ্চধারা কীভাবে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

(১) অর্থের উন্নতি/অর্থোৎকর্ষ ঃ

কোনো শব্দের অর্থ যদি এমনভাবে পরিবির্তত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো তার চেয়ে সম্মানিত বা আদৃত ভাব বা বস্তুকে নতুন অর্থে প্রকাশ করা হচ্ছে, তাবে তাকে অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ বলে। যেমন 'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ গৃহ, অর্থোন্নতির ফলে 'দেবগৃহ'। একইভাবে 'ভোগ' খাদ্যসামগ্রীর সামান্যতা থেকে দেবতার আহার্যে উন্নীত। 'সম্ভ্রম' শব্দের মূল অর্থ 'ভয়', এখন তা 'মান্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'দর্শন' এর অর্থ দেখা হলেও দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করাতেই এই শব্দটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করি।

(২) অর্থের উন্নতি/অর্থোপকর্ষ ঃ

কোনো শব্দ অর্থপরিবর্তনের ফলে যদি এমন হয় যে, মূল অর্থ অপেক্ষা তুচ্ছ বা হীন কোনো বস্তু বা বিষয়কে, নতুন অর্থের দ্বারা বোঝান হচ্ছে, তবে তাকে বলে অর্থের অবনতি বা অর্থাপকর্ষ। যেমন 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি হলেও প্রচলিত অর্থ 'সুদখোর'। 'ইতর' শব্দের বাচ্যার্থ 'অন্য' বা 'অপর', কিন্তু এখন 'ছোটলোক' বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'প্রীতি' মূল অর্থ 'প্রেম'কে বহন করলেও স্বরভক্তিজাত 'পীরিতি' কিন্তু 'অবৈধ প্রণয়' বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ লক্ষ্য করে দেখুন, অর্থোন্নতি এবং অর্থাবনতির উভয় ক্ষেত্রেই বাচ্যার্থকে পিছনে সরিয়ে প্রচলিত বা প্রায়োগিক অর্থগুলিই ক্রমশ প্রবল ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে।

(৩) অর্থের সংকোচ ঃ

প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবেকে বোঝায়, এবং কালক্রমে যদি তার অর্থ পূর্ব প্রচলিত অর্থের কোনো একটিমাত্র বস্তু বা ভাবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে, তবে অর্থপরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়াকে বলে অর্থসংকোচ। যেমন—'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'খাদ্যবস্তু' এখন শুধুই 'ভাত'। 'মৃগ' শব্দটিকেও 'পশু' অর্থের ব্যাপকতা থেকে সঙ্কুচিত করে নিয়ে এখন শুধুমাত্র 'হরিণ' অর্থে আমরা প্রয়োগ করি। আরও দেখুন, সংস্কৃত থেকে আগত 'প্রদীপ' শব্দটি সবরকমের আলো বোঝাবার জন্য প্রস্তুত থাকলেও আমরা তার ব্যবহারসীমা কমিয়ে নিয়েছি একটি বিশেষ ধরনের আলোর ক্ষেত্রে, মাটি বা পিতলের বিশেষ পাত্রে তেল ও সলতে দিয়ে যে আলো জ্বালানো হয়।

(৪) অর্থের প্রসার/অর্থবিস্তার ঃ

শব্দের মূল অর্থ যখন কোনো কারণে তার উদ্দিষ্ট বস্তু বা ভাবকে অতিক্রম করে ওই প্রাথমিক বস্তু বা ভাব নিরপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার অর্থের প্রসার ঘটে। অর্থাৎ এটি অর্থসংকোচের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া আমরা বলতে পারি। অর্থের সঙ্কীর্ণতা কালক্রমে অধিকতর বস্তু ও ব্যাপকতর ভাবপ্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রসারিত হয়ে যায়। যেমন কালো রঙের উপাদানে তৈরি লিখবার তরল উপাদান ছিল 'কালি'। এখন যেকোনো বর্ণের লিখন মাধ্যমই 'কালি'। 'গঙ্গা' শব্দজাত 'গাঙ' তার প্রায়োগিক অর্থসীমা বাড়িয়ে. নিয়েছে যেকোনো নদী অর্থে। 'লক্ষ্মী' শব্দের সম্প্রসারিত অর্থ দাঁড়িয়েছে শান্তশিষ্ট। 'তৈল' শব্দের মূল অর্থ তিলের নির্যাস, এখন সর্ষে বা নারকেলের নির্যাসও তৈল বা 'তেল'।

(৫) অর্থ-সংক্রম/অর্থসংশ্লেষ ঃ

শব্দের অর্থপরিবপর্তন কতগুলি স্তর অনুযায়ী ঘটে। এই ধাপগুলি অতিক্রম করার পর শেষপর্যন্ত শব্দটির যে অর্থ দাঁড়ায়, সেই নতুন অর্থের সঙ্গে মূল অর্থের কোনো যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে ভিন্ন কোনো বস্তুতে সরে এসেছে। এইভাবেই অর্থসংক্রম ঘটে। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে পরিচিত দৃষ্টান্ত হ'ল 'সন্দেশ' শব্দটি। এর মূল অর্থ ছিল 'সংবাদ, খবর'। প্রেরক সংবাদ নিয়ে যেতেন কিছু মিষ্টান্নসহ। এই অনুষঙ্গেই শব্দটি মূল অর্থটিকে হারিয়ে 'মিষ্টান্ন' অর্থটিকে আঁকড়ে ধরেছে। অনুরূপভাবে দেখুন 'পাত্র' শব্দটিরও পরিণতি। এর মূল অর্থ ছিল 'পান করার আধার', ক্রমশ এটি 'কন্যা দান করার আধার'-এ পরিণত হয়েছে অর্থ সংক্রমের ফলে।

উপরিউক্ত এই আলোচনায় আমরা দেখলাম যে প্রায় প্রত্যেক শব্দই একটি অর্থ বোঝাবার জন্য প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে,. সময়ের সাথে সাথে বিবর্তনের অমোঘ নিয়মকে স্বীকার করে নিয়েছে তার অর্থবোধের ক্ষেত্রে। এতে ভাষার অর্থগৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে, সাহিত্য রচনায় শাব্দিক শুষমাবৃদ্ধির কাজেও এটি সহায়ক হয়ে উঠেছে। শব্দের অর্থপরিবত৪নের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে তাই মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি ও চিন্তাধারারই সাক্ষ্যবহনকারী।

৩১.৮ সুভাষণরীতি

অকল্যাণসূচক অথবা নিন্দিত বা কুৎসিত কিংবা বিপজ্জনক কোনো অর্থকে কল্যাণবাচক, ভদ্ররূপ দেবার জন্য মানুষ অনেকসময় প্রায় বিপীত বা পৃথক অর্থবোধক শব্দের আশ্রয় নেয়। একে এককথায় সুভাষণ (Euphemism) রীতি বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

উদ্দিষ্ট অর্থের বিপরীত অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষ্যণীয়। যেমন ধরুন—গার্হস্থ্য জীবনে চাল না থাকা অমঙ্গালে। তাই চালের অভাব বোঝাতে 'বাড়ন্ত' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় (চাল বাড়ন্ত)। বিদায় গ্রহণ প্রিয়জনের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ঘটনা। তাই কোথাও যাবার সময় 'আসি' শব্দটি প্রয়োগ করে 'যাই'-এর অর্থ বোঝানো হয়। বসন্ত রোগ যতই কষ্টকর হোক না কেন, তাকে 'শীতলার দয়া' বা 'মায়ের দয়া' বলে মেনে নেবার মানসিকতাও আমাদের মধ্যে দেখা যায়। নিম্নবর্ণের মানুষকে 'হরিজন' নামে অভিহিত করা, পাচককে 'ঠাকুর' বলে ডাকা বা সুদখোরকে 'মহাজন' রূপে চিহ্নিত করার মধ্যেও এই প্রবণতাই সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আবার দেখুন, কখনও কখনও অভিপ্রেত অর্থবোধক শব্দের থেকে পৃথক শব্দ ব্যবহার করেও আমরা বক্তব্যকে সুভাষিত করে তুলি। যেমন—সাপকে 'লতা' বা সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘকে 'বড় শিয়াল' বলার মধ্য দিয়ে, এদের প্রকৃত নামোচ্চারণে যাতে এদের সাক্ষাৎ না পেতে হয়, এমনই একটা স্বস্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা মিশে থাকে।

তবে সুভাষণের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আলংকারিক ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ প্রয়োগে। মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে আমরা বলি 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি', মানুষের মৃত্যুর পর নশ্বর শরীরের পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবার অমোঘ পরিণতির কথাই এখানে বিবৃত। সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে আবার এই অর্থেই 'তিরোভাব' 'মহাসমাধি', ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করি। শূন্য ভাণ্ড প্রকাশ করতে গিয়ে বলি—ভাঁড়ে মা ভবানী।'

সুভাষণের কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখুন, একধরনের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাপ্রকাশের ব্যাপারটিও লক্ষ্য করা যায়। কন্যাসন্তান যাতে জন্মগ্রহণ না করে, তাই শেষ জাতিকার নাম 'আন্নাকালী' (আর না কালী) রাখার প্রথা এই বাংলাদেশেই প্রচলিত। মৃত্যুর পর চিরআনন্দময় স্বর্গে ঠাঁই পাবার ইচ্ছায় 'স্বর্গলাভ' কথাটি ব্যবহার করে মৃত্যুকে সহনীয় করে তোলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের সুপ্ত বাসনার ইঙ্গিত মেলে এই জাতীয় সুভাষণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে।

প্রসঙ্গত সুভাষণের বিপরীত একটি রীতির কথাও কিন্তু আমরা এই অর্থপরিবর্তনের সূত্রে দেখতে পারি। ভালোকে মন্দরূপে প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকে ভাষায় সৃষ্টি হয় দুর্ভাষণ (pejoration) যার নিদর্শন বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও সুলভ। কখনও আদর জানাতেক, কখনও অমঙ্গালের হাতে থেকে রক্ষা করতেই দুর্ভাষণ প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায়। নাতিকে আদর করে 'শানা', বাৎসল্যের আতিশয্যে সন্তানকে 'দুষ্টু, পাজি, পাগলা', পুত্র বা পুত্রোপম ব্যক্তিকে 'বেটা' (যার প্রকৃত অর্থ বিনা মাইনের মজুর) সম্বোধন করার মধ্যে দুর্ভাষণের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। আবার দেখুন, সন্তানকে যম যাতে স্পর্শ না করেন, তাই ঘৃণ্যবস্তু হিসাবে পরিচিতদানের উদ্দেশ্যে থেকে আদরের সন্তানের নাম রাখা হয় 'গুয়ে' বা 'গোবরা। অর্থাৎ মনের ভাব যাই থাকুক না কেন, উচ্চারিত নামে যেন তার বিপরীতভাব প্রকাশ করে, বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটা ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায়।

৩১.৯ শব্দার্থ ও ইতিহাস উপাদান

শব্দার্থতত্ত্ব ও তার আনুষাঙ্গিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি নতুন শাখা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, যাকে বলা যায় 'ভাষা-আধারিত প্র- ইতিহাস' (Linguistic Palaeontology)। বিষয়টি ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং ভাষা বিজ্ঞান—সকল দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আগ্রহোদ্দীপক হলেও বাংলাভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে এটির আবির্ভাব অনেক দেরিতে। বিজ্ঞানের নানা শাখায়, জীবাশ্মের অস্তিত্ব থেকে, পৃথিবীর আদিমপর্বের অথচ অধুনালুপ্ত বিভিন্ন জীববিষয়ে জ্ঞানলাভ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ভাষাশাস্ত্রেও এইভাবেই বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থবৈচিত্র্যের নানা স্তর থেকে প্রাচীনকালের মানবসভ্যতার নানা চকমপ্রদ তথ্য অনুসন্থানের প্রচেষ্টা চালানো হয়। একেই ভাষা আধারিত প্র- ইতিহাস বলা হয়। অনক সময় একই ভাষার নানা শব্দের বিশ্লেষণে, আবার অনেক সময় বিভিন্ন ভাষা যারা পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত হলেও পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত (যেমন সংস্কৃত ইংরেজি ফরাসি) এমন ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা থেকে সভ্যতার বিবর্তন ও ইতিহাসের অগ্রগতির একটি স্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে পাবার চেষ্টা করা হয়।

আমাদের প্রদর্শিত কিছু দৃষ্টান্তকেই আমরা বর্তমান বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। যেমন ধরুন 'আর্য' শব্দটি। বুৎপত্তি অনুযায়ী যার অর্থ গতিশীল, ভ্রাম্যমাণ জাতি। কিন্তু অরণ্যনির্ভর এই জাতি ভারতবর্ষে এসে ক্রমশ কৃষিনির্ভর হয়ে ওঠে এবং স্থিতিশীল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পরেও 'আর্য' নামটিই বহাল থাকে। আইদম এই জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের প্রাথমিক উপায়টি চিরস্থায়ী হয়ে আছে এই নামটির মধ্যে।

ইন্দো-ইউরোপীয় এই সম্প্রদায় প্রধানত মৃগয়াজীবী এবং যাযাবর হলেও তাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কসূত্র যে বেশ দৃঢ়বন্ধ অবস্থায় ছিল, তার প্রমাণ হিসাবে ভাষাতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন—প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারূপে-পিতা (পিতর্), মাতা (মাতর্), ভ্রাতা (ভ্রাতর), দুহিতা (দুহিতর) ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক শব্দগুলির ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিজিত পক্ষের বিবাহযোগ্য কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে ঘোড়ার পিঠে নিয়ে আসা হত। এই বিশেষরূপে নিয়ে আসার অর্থেই 'বিবাহ' শব্দটির প্রয়োগ ছিল। কালের অগ্রগতিতে এই প্রথা অবলুপ্ত। কিন্তু 'পানিগ্রহণ' বা 'বিবাহ' শব্দ এখনও সেই পূর্বপ্রথার স্মৃতি বজায় রেখেছে তাদের অস্তিত্বে।

'কলম' হিসাবে আজ আমরা যে বস্তু ব্যবহার করি তার আদিরূপ নির্মিত হয়েছিল শর বা খাগ দিয়ে, যাকে বোঝাবার জন্যই মূল 'কলম' শব্দটির উৎপত্তি। অথচ আজ দেখুন, ধাতু, কাঠ, প্লাস্টিক যাতেই কলম তৈরি হোক না কেন, প্রথম লেখনী হিসাবে শর বা খাগের ব্যবহৃত হবার ইতিহাস সংগোপনে রয়ে যায় 'কলম' শব্দটিকে এখনও ব্যবহার করার মধ্যে।

৩১.১০ সারাংশ

শব্দ ও তার অর্থপ্রকাশক ক্ষমতাকে নিয়ে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, তার মূল সূত্রগুলিকে এবার সংক্ষেপে আর একবার দেখে নিই আসুন। আমরা দেখলাম শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনো নিত্যসম্পর্ক নয়, বরং একটি পরিবর্তনশীল সম্পর্ক বিদ্যমান, যা নির্ভর করে আছে বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থের উপর।

আমরা আরও দেখলাম—স্থান, কাল এবং বক্তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের উপর শব্দের অর্থপরিবর্তনের বিষয়টি নির্ভরশীল। একভাষার শব্দ অন্য ভৌগলিক প্রতিবেশে ব্যবহৃত হলে, ভাবাবেগের আতিশয্যে আলংকারিক বাগ্‌বিন্যাসে, শব্দের যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত, সাদৃশ্যের প্রভাবে, সংস্কার বা বিশ্বাসের কারণে উচ্চারণপ্রয়াসে শৈথিল্যের ফলে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে।

অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে শব্দের মোটামুটি পঞ্চমুখী গতি দেখা যায়। অর্থের উন্নতি ও অবনতি, অর্থের প্রসার ও সংকোচ এবং অর্থ সংক্রম—এই পাঁচটি উপায়ে শব্দার্থ পরিবর্তিত হয়। এই সবকটি ক্ষেত্রেই, পূর্বোল্লিখিত কারণগুলির কোনো একটি বা একাধিক কারণ একযোগে অর্থান্তরের দায় বহন করে।

শব্দের অর্থ আমাদের অবচেতনেই আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে। প্রাচীনকালে কোনো বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত শব্দ, একালে ভিন্নতর অর্থে প্রযুক্ত হলেও, তার রূপগত গঠনে সুপ্ত থাকে আদিঅর্থের দ্বারা প্রকাশক তথ্য। শব্দার্থ তাই ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবেও একটি পৃথক গুরুত্বের অধিকারী।

৩১.১১ অনুশীলনী

১। অর্থপরিবর্তনের কোন্ বিশেষ কারণটি প্রযুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থান্তর ঘটেছে বলুন ঃ

মহারাজ (পাচক অর্থে), রামধনু, ঝি, শাঁখা বাড়া, গবাক্ষ, অশ্রুবন্যা, সব্জি।

২। অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিচয় দিন ঃ

(ক) শব্দের লক্ষণাশক্তি

(খ) ব্যঞ্জনাগত অর্থ বা ব্যঙ্গার্থ

(গ) দুর্ভাষণ

(ঘ) অর্থপরিবর্তনের আলংকারিক কারণ

৩। অর্থপরিবর্তনের কোন্ কোন্ ধারায় নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থান্তর ঘটেছে, তা বলুন ঃ

বিভীষণ, থান (< স্থান), ফলার, নোয়া (স্ত্রীলোকের লৌহবলয়), উজবুক (< জাতিবাচক 'উজবেক')।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বাংলা শব্দের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন ঃ

(ক) অর্থের উন্নতি এবং অবনতি।

(খ) শব্দার্থে ঐতিহাসিক উপাদান।

(গ) অর্থের প্রসার এবং অর্থসংক্রম।

(ঘ) শব্দের অর্থ সংকোচন।

৩১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

২. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

৩. ড. জীবেন্দু রায়—বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।